এই সময়
সংবাদপত্র

* কথাসরিৎ *

পৃথিবীর সব কিছু সব সময় তুমি হাতের মুঠোয় ধরে রাখবে, কিছুই হারাবে না— হারাতে দেবে না, এ হয় না, হওয়া উচিত নয়।

— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বিপদ

মহানগরের পরিবেশে লাল সঙ্কেত। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা, পরিভাষায় যা পার্টিকুলেট ম্যাটার ২.৫ বলে পরিচিত, কলকাতায় সোমবার তার পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে ছ'গুণ বেশি ছিল বলে জানিয়েছে মার্কিন কনসুলেটের স্বয়ংক্রিয় দূষণ-পরিমাপক যন্ত্র। চিকিৎসক মহলের উদ্বেগ, এই দূষণ শহরবাসীর স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। কলকাতার বায়ু দূষণের এই মাত্রায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও। এর ফলে সার্বিক ভাবে শহরবাসীর মধ্যে শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা। হাঁপানিতে আক্রান্ত মানুষ এবং শিশুরা আক্রান্ত হবেন সব থেকে বেশি। পরিস্থিতি এমনই যে রাজ্য সরকার ও পুরসভার আপৎকালীন ভিত্তিতে পরিস্থিতির উন্নতি সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করা জরুরি। দুর্ভাগ্যবশত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে বার্তা মিলেছে তাকে আশাপ্রদ বলা কঠিন। মার্কিন কনসুলেটের দূষণ পরিমাপ প্রক্রিয়ায় অনাস্থা প্রকাশ করেই আপাতত দায়িত্ব সেরেছেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তৃপক্ষ।

অথচ বাস্তব এটাই যে কলকাতার এই উদ্বেগজনক বায়ুদূষণ কোনও একটি বিশেষ দিনের আকস্মিক ঘটনা নয়। বাস্তব এটাই যে এই পরিস্থিতি দীর্ঘকালীন। ২০১৫ সালে সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয় কলকাতার বাতাসে উপস্থিত 'পার্টিকুলেট ম্যাটার' স্বাভাবিকের থেকে তিন গুণ বেশি। ২০১৪ সালে টোকিও ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি-র বিশেষজ্ঞদের একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল এশিয়ার আটটি অতি-দূষিত শহরের মধ্যে কলকাতার স্থান সবার উপরে। কিছুকাল আগে অন্য একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল এ শহরে ২৬ শতাংশ স্কুলপড়ুয়ার ফুসফুস 'দুর্বল' এবং ৯ শতাংশের 'অত্যন্ত দুর্বল'। অর্থাৎ এ শহরে ৩৫ শতাংশ শিশুর ফুসফুসের ক্ষমতা স্বাভাবিক নয়। কলকাতার বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উৎস শহরের রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহন। কাজেই অবিলম্বে গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে কলকাতার রাস্তায় চলাচলকারী গাড়ির মাত্র ২০ শতাংশ যথা সময়ে ধোঁয়া-দূষণের পরীক্ষা দিয়ে থাকে। কী ভাবে প্রতিটি গাড়িকে এই পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা যায় তার একটি বাস্তবানুগ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। শহরের ক্রমবর্ধমান দূষণের কথা মাথায় রেখে সামগ্রিক নগর পরিকল্পনাকেই ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। কাজটি সহজ নয়। কিন্তু সঙ্কট চরম পর্যায়ে পৌঁছনোর আগে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী একটি দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ শুরু হওয়া জরুরি।

আলো

শহরে শীতের আমেজটি জমজমাট উপভোগ্য হয়ে ওঠে বড়োদিনে পার্ক স্ট্রিট আলোকমালায় সেজে উঠলে। পূর্ব প্রান্তে জওহরলাল নেহরু রোড থেকে পশ্চিমে রফি আহমেদ কিদওয়াই স্ট্রিট পর্যন্ত রাস্তার দু'ধার ঝলমল করে ওঠে মাঝরাত পর্যন্ত খানা-পিনা, আমোদ-আহ্লাদ, হুল্লোড়-ফুর্তির আয়োজনে। দৈনন্দিন বাস যাঁদের, তাঁরা হয়তো খানিক বিব্রত বোধ করেন এক-আধ দিন হঠাৎ আলো দেখতে আসা মানুষের ঢল নামলে। ধীরে সুস্থে বেরিয়ে ফিরে রেস্তোঁরাবাজির সুযোগ থাকে না পাল পাল মানুষের ভিড় ঠেলতে হলে। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, যতখানি জনসমাগম এই গোটা পথটিতে সুস্থ স্বাভাবিক উপায়ে সম্ভব, উৎসবের প্রচারের ফলে তার তিন গুণ মানুষ কতখানি কাম্য। আলোকসজ্জা হয়তো ওই নবাগতদের জন্যই

লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় গুজরাটে বিজেপির ভোট কমেছে ১০ শতাংশ, বিধানসভা আসন কমেছে ৬৬টি

অবশেষে মোদীর 'আচ্ছে দিন' প্রশ্নচিহ্নের মুখে?

গ্রামীণ ও শহুরে ভোটের গতিপ্রকৃতির ফারাক থেকে স্পষ্ট, নব-উদারবাদের ঢক্কানিনাদের তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না গ্রামের অসংখ্য মানুষ। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

অজিত নাইনান

১৮ ডিসেম্বর গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছে। দুই রাজ্যেই কেন্দ্রের শাসক দল জিতেছে। হিমাচল প্রদেশ ছোটো রাজ্য এবং সেখানে ১৯৯০ সাল থেকে প্রত্যেক বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দল পরিবর্তন হয়। এবারের নির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অন্য দিকে গুজরাটে, এবারের নির্বাচন ধরলে কেন্দ্রের শাসক দল টানা ছয়বার জিতল। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এহেন কৃতিত্ব কেবলমাত্র ত্রিপুরায় আছে। ১৯৯৬ থেকে সেখানে বামফ্রন্টের টানা ছয়বারের নির্বাচনী সাফল্য উজ্জ্বল। পশ্চিমবঙ্গে (১৯৭৭-২০১১ সাল পর্যন্ত টানা সাত বারের জয়ী) বামফ্রন্টের রেকর্ড অবশ্য এখনও কোনও রাজনৈতিক শক্তি ভাঙতে পারেনি। গুজরাটে এবারের নির্বাচন বিজেপির জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। এক দিকে টানা বাইশ বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া তুমুল ছিল। এই নির্বাচন বিজেপি জিতল তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতার কারণে। এহেন সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় এই রাজ্যে ২০০১-এ বামফ্রন্ট দেখাতে পেরেছিল যদিও সেই নির্বাচনে বামফ্রন্ট দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে সসম্মানে জয়ী হয়। আর এই নির্বাচনে বিজেপি কোনও রকমে মুখরক্ষা করতে পেরেছে। নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে, ক্যাডার-নির্ভর দুই রাজনৈতিক দলের তুলনা কেবল এই পর্যন্ত করা যেতে পারে।

এবারের গুজরাট নির্বাচন কয়েকটা বার্তা দিল। প্রথমত, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় মোদী হাওয়া কিছুটা ফিকে। বস্তুনিষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করার সময় যে কোনও রাজ্যের শেষ বড়ো নির্বাচনের (যেখানে সারা রাজ্যব্যাপী ভোট হয়েছে) সঙ্গে তুলনা না টানলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকে। নিম্নোক্ত সারণি দেখলে পরিষ্কার যে গত লোকসভার তুলনায় গুজরাটে বিজেপির প্রায় দশ শতাংশ ভোট কমেছে। ২০১৪ সালে, বিধানসভা ভিত্তিক আসনসংখ্যার নিরিখে ৬৬টি আসন কমেছে।

কংগ্রেস দল এবার সুকৌশলে প্রশ্ন তুলেছিল তথাকথিত গুজরাট মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। সেই উন্নয়নের মডেল এক দিকে কারখানা বানিয়েছে ঠিকই কিন্তু বিপুল অংশের মানুষের জন্য সুলভ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নতুন প্রজন্মের জন্য রোজগার ও চাকরি দিতে তা ব্যর্থ। অন্য দিকে সারা দেশে কৃষি সংকট চলছে এবং কৃষি ক্ষেত্রে আয় কমছে। আর গুজরাটে অবস্থিত বড়ো পুঁজিপতিদের আয় বাড়ছে। ২০১৪ সালে মোদীজি যে সুদিনের কথা শুনিয়েছিলেন সেটা গুজরাটের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল। ২০১৫ সালে গুজরাটের পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের কাছে বিজেপি গোহারান হারার পরে, এই নির্বাচন প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখরক্ষার ব্যাপার ছিল। গুজরাট নির্বাচনের প্রচার দেখে মনে হচ্ছিল ভুভারতে আর যেন কোনও সমস্যা নেই। থাকলেও সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য সংসদ খোলা হল না। এবারের গুজরাট নির্বাচনের প্রচার দেখে মনে হল প্রধানমন্ত্রী যেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী।

দ্বিতীয়ত এই নির্বাচনে গুজরাটের অসম উন্নয়ন মডেল থেকে উদ্ভাবিত ক্ষোভের সঙ্গে জুড়েছিল জাত-পাত ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনের কয়েকজন নতুন উদীয়মান তারকার উত্থান। ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকের সামাজিক আন্দোলনের নেতাদের ধারাকে বজায় রেখে এই তরুণ তুর্কিরা এবার নতুন উদ্যমে গুজরাট বিধানসভায় যে বিরোধী ভূমিকা পালন করবে তা আগামী দিনে বিজেপিকে যথেষ্ট চাপে রাখতে পারে। উপরন্তু গ্রামীণ গুজরাট ও শহুরে গুজরাটের মধ্যে ভোটের গতিপ্রকৃতির ফারাক দেখা গেল। নব-উদারবাদের ঢক্কানিনাদের তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না বিপুল অংশের গ্রামীণ মানুষ। গুজরাট আর একবার সেই কথাটা চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

তৃতীয়ত, এই নির্বাচন বিজেপিকে একটা অশনি সংকেত দিল যে নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারগুলো রক্ষা না করে এবং নাগরিকের জীবনকে সম্মান না করে যদি ক্ষমতার দম্ভে উদ্ধত হয়ে দেশ চালান তা হলে ভারতীয় গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ ছেড়ে কথা বলে না। গুজরাটের মানুষ একটি শক্তিশালী বিরোধী পক্ষকে বেছে নিয়ে ওই রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি সুবিচার করেছেন।

চতুর্থত, গুজরাট নির্বাচনে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হিমাচল ও গুজরাট নির্বাচন যে কেন এক দিনে ঘোষণা হল না তা নিয়ে কিন্তু নির্বাচন কমিশন এখনও কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। আমাদের দেশে যে কতিপয় বড়ো প্রতিষ্ঠানের উপর মানুষের ভরসা আছে তার মধ্যে নির্বাচন কমিশন অন্যতম। সেই প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের নির্বাচনী গণতন্ত্র।

১৯৯০-এর দশক থেকেই সংঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা, মণ্ডল রাজনীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটি গরিব ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করতে শুরু করে। উদ্দেশ্য হল, সংখ্যালঘুর জুজু দেখিয়ে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে বহুত্ববাদ আছে, তাকে ভেঙে একমাত্রিক 'হিন্দুত্ব' প্রচার করা। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর আরাধনা ছেড়ে কেবল এক দেবতার পুজো করার মানসিকতা তৈরি করাই হল এই রাজনীতির উদ্দেশ্য। এবং হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুত্বের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে সেগুলোকে গুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হল এই ধরনের রাজনীতির একটা উল্লেখযোগ্য দিক। এই প্রচারের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে মিথ তৈরি করা একটা কৌশল। এবং সেই মিথকে বার বার বলা এবং জোর দিয়ে বলা। একটা মিথ্যে কথা বার বার বলে সেটা সত্যি প্রমাণ করার চেষ্টা এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে প্রায় একটা শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। গুজরাট নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ফেক নিউজ, গুজব, এবং কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়া নিম্নমানের ব্যক্তিগত স্তরের আক্রমণ অ-রাজনৈতিক মন ও অ-রাজনৈতিক কার্যপ্রণালীকে বার বার উন্মোচন করেছে। আর কিছু মানুষ আছেন যাঁরা এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড-কেই একমাত্র সত্য মনে করেন। বাস্তব পৃথিবীর দিকে তাকানোর সময় তাঁদের নেই। ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডেই তাঁরা তাঁদের অভিযোগ, জ্বালা, যন্ত্রণা, হিংসা সব কিছু উগরে দেন। এহেন কাজকর্মের জন্য তাঁদের ট্যাক্সও দিতে হয় না, ঘৃণা-সর্বস্ব বাণী ছড়ানোর জন্য দেশে যে আইনকানুন আছে সেগুলো রাষ্ট্রও বলবৎ করে না আর ভদ্রলোকেরা মানহানির মামলাও করেন না। এই সুযোগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল ক্যাম্পেইন নিয়ে মৌলবাদী শক্তি করে-কম্মে খাচ্ছে।

কিছু ক্ষেত্রে মুসলিম মৌলবাদীদের আলটপকা কথা, প্ররোচনামূলক ব্যবহার ও ভয়ঙ্কর কিছু কাণ্ড হিন্দুত্ববাদীদের সুবিধা করে দেয়। এই দুই শক্তি আসলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুগুলোকে গুলিয়ে দিতে কেবলমাত্র ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে বেঁধে না রেখে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা রাজনীতি ও সেই রাজনীতিকে ১৯৮০র দশকে কংগ্রেস দল যে প্রশ্রয় দিয়েছিল (শাহ বানু ও শিলান্যাস), সারা দেশ, সেই ভুলের জন্য এখনও খেসারত দিচ্ছে। কংগ্রেস দলের বর্তমান সভাপতি আশা করি তাঁর পিতার পুরনো ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেবেন। আগামী বছর যে সব বড়ো রাজ্যে কংগ্রেস ও বিজেপি লড়াই করবে (কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থান) সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুর মেলবন্ধন ঘটিয়ে কি কংগ্রেস দল কামাল করতে পারবে? সময় সেই উত্তর দেবে।

গুজরাটের ফল এই রাজ্যে বিজেপি নেতাদের কিছুটা চাপেই রাখবে। কারণ ১৫০ আসনের যে ফানুস ফোলানো হয়েছিল তা চুপসে গেছে। বাংলার বাস্তবতা গুজরাটের থেকে আলাদা। এখানকার ইস্যুগুলো আলাদা। বাংলার রাজনৈতিক প্রবণতা হল একদলীয় শাসনের দীর্ঘমেয়াদি কর্তৃত্ব। উপরন্তু আগামী পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি এই রাজ্যে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় স্থান পাবার জন্যই লড়বে। রাজ্য বিজেপির মধ্যে ১৯৮০র দশকের কংগ্রেস দলের মতোই বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো বিজেপির কোনও জননেতা বা জননেত্রীও নেই। তার পর এই রাজ্যে আসামের মতো কোনও মুসলিম-প্রধান পার্টি নেই যা দেখিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণের কূট রাজনীতি এখানে জমি পাবার চেষ্টা করবে। এখানকার সংখ্যালঘুদের আস্থা আছে বাংলার বহু দশকের ধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতির প্রতি। অন্য দিকে এই রাজ্যের রাজনৈতিক প্রবণতা হল যে গ্রামীণ মানুষ, শহরের ভোটারের তুলনায় অনেক দেরিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ডাকে সাড়া দেয়।

এই রাজ্যে কিন্তু যেটা পরিবর্তন হচ্ছে না সেটা হল বহু মানুষকে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না দেওয়ার পুরনো রীতি। সেই রীতি কিন্তু এ বার পরিবর্তনের সময় এসেছে। রাজ্যের শাসক দলকে বুঝতে হবে যে তারা যদি কেন্দ্রের শাসক দলের মতো বিরোধীশূন্য রাজনীতি করার খেলা খেলে তা হলে সেটা আজ নয় কাল হিতে বিপরীত হবে। বাংলার রাজনীতি আগামী দিনে সেই ধৈর্য ও স্থিরতার পরিচয় দেবে, এই আশা রাজনীতির এই অধ্যাপকের আছে।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

গুজরাট ভোটের পাটিগণিত	মোট আসন সংখ্যা	বিজেপি ▼	ভোট শতাংশ %	কংগ্রেস+ ▼	ভোট শতাংশ %
২০১২ বিধানসভা	১৮২	১১৫	৪৭.৮৫	৬১.	৩৮.৯৩
২০১৪ লোকসভা*	২৬	২৬	৫৮.৮৯	০	৩৩.৭৬
	১৮২	১৬৫	৫৮.৮৯.	১৭	৩৩.৭৬
২০১৭ বিধানসভা	১৮২	৯৯	৪৯.১০	৮০	৪১.৪০

*নীচের পঙ্‌ক্তিতে বিধানসভাভিত্তিক ফলাফল

তথ্যসূত্র: ভারতের নির্বাচন কমিশন